

আমাদের
অপারেশন মাংকি ফরেস্ট

সাজিদ হাসান

প্রতিভা
প্রকাশ

লেখকের কথা

আসসালামু আলাইকুম, ছোট্ট বন্ধু। কেমন আছো তুমি? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো! ‘অপুর জঙ্গলরহস্য’-এর পর তোমার জন্য আবারও মজার গল্প নিয়ে হাজির হলাম।

বাঙ্গিপুরের চার তরুণ তুর্কী—লাড্ডু ভাই, মিথেন, বিটু ও টুকুন। লাড্ডু ভাই সবার লিডার, যেন সাহসের জীবন্ত প্রতীক। মিথেন খুব মেধাবী; চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। বিটু রায়পুরার সন্তান, মাটির ভাষাতে কথা বলে। আর টুকুনটা বেশ রোগাপটকা। টমেটো দিয়ে পুঁটিমাছের ঝোল ও খুদের পোলাও খায়। আর বারবার বিপদে পড়ে।

চার কিশোরের পরীক্ষা শেষ, হাতে অনেক সময়। তাই হঠাৎ ওদের মাথায় পোকা গজাল, অভিযানে যাবে। কোথায় যাওয়া যায়?

মাংকি ফরেস্ট। গহীন অরণ্য, বিশাল উঁচু উঁচু পর্বত আর অবিশ্বাস্য সব রহস্য। লিডার লাড্ডু ভাই ও তার সাজপাঙ্গরা খুশির ভেলায় ভাসতে ভাসতে সেখানে পা রাখল।

কিন্তু!

সেখানে গিয়ে ওরা এমন সব অদ্ভুত বিপদে পড়ল, আর কী যে কাণ্ডকারখানা করল!

‘আমাদের অপারেশন মাংকি ফরেস্ট’-এর আইডিয়াটা পেয়েছি ‘টেনিদা’-র গল্প পড়তে গিয়ে। তারপর একদিন পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে মনে হলো, তোমাদের জন্যও মজাদার কিছু লিখি। সেই

চিন্তা থেকেই লাডুভাইদের আগমন ।

ছোট্ট বন্ধু, আজ এ পর্যন্তই । আবার হয়তো দেখা হবে নতুন
কোনো মজাদার গল্প নিয়ে । সে পর্যন্ত তোমাকে জানাচ্ছি বিদায় ।

আল্লাহ হাফেজ!

এক



অবশেষে এসএসসি পরীক্ষাটা শেষ হয়েই গেল।

বেলা বারোটা বেজে তেরোটা। বাঙ্গিপুরের বিখ্যাত ‘ব্রিটিশ ধরে ঠ্যাঙারে’ মাঠের পাঁচিলে আমরা তিনজন বসে ঝালমুড়ি চিবুচ্ছি। আমরা বলতে আমাদের লিডার, ‘বাঙ্গিপুর জ্যাকফ্রুট ক্লাব’-এর আজীবন সভাপতি লাড্ডু বাঘা ওরফে লাড্ডু ভাই। পড়ালেখায় নিয়মিত ডাব্বা মারলেও নিজ গুণে আমাদের লিডার। আছে ক্লাসের ফাস্ট বয় মিথেন মোড়ল। লাইফে যার কখনো সেকেন্ড হওয়ার রেকর্ড নেই। আর শেষমেশ আমি। এই টুকুন ব্যাপারী—গুঁড়ো পুঁটি আর টমেটোর ঝোল মেখে পোলাও খুদের ভাত খাওয়া টুকুন। বছরের ছয় মাস সর্দি-কাশিতে ভুগি, আর দাদির বানানো লতাপাতার জড়িবিটি খাই।

ক্লাবের চতুর্থ মেম্বার বিটু গোলন্দাজ। যেমন নাম, তেমন কাজ। সে গেছে হাবুল মোড়ের কাবুল চাচার দোকান থেকে বিখ্যাত ‘বাবুল আলুপুরি’ নিয়ে আসতে।

বিটুর জন্ম এই বাঙ্গিপু্রে নয়, নরসিংদীর রায়পুরার চরাঞ্চলে। পাশের পাড়ায় আমাদের প্রাইমারি স্কুলটা আছে না? সেই স্কুল পেরিয়ে বাঘাবাড়ির মোড়ে তার বোনের শ্বশুর বাড়ি। সেই আদিকাল থেকে বিটুদের রায়পুরা হলো ট্যাটা উৎসবের রাজধানী। ট্যাটা চিনো তো? মাছ ধরার কোঁচের মতো। হেভি ডেঞ্জারাস। এক বার বিঁধতে পারলেই গেছ। সোজা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। লাড্ডু ভাই বলে, এই ট্যাটাগুলো কেমন যেন একটু ইয়ে।

আর ট্যাটা নিয়ে উৎসব? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা

ইল্লা বিল্লাহ। যাকে বলে গিয়ে এক্কেবারে শয়তানের ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’। যে এলাকায় এমন শয়তানি কারবার হয়, সেখানে ছেলেপুলে মানুষ করা যায় নাকি! তাই তো সেই ল্যাডাকালে বিটুর বাবা-মা তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই থেকে বিটু বাঙ্গিপুরের আলো-হাওয়া খাচ্ছে, বাঁশের মতো লম্বা হচ্ছে। আর নিজের প্রতিভা দিয়ে দিনদিন বাঙ্গিপুর জ্যাকফ্রুট ক্লাবের নাম উজ্জ্বল করছে।

ঝালমুড়ির শেষ দানাটা মুখে পুরে লাড্ডু ভাই হাতে হাত ঘষতে শুরু করে দিলো। পেটে খিদের চিকা গোলা খেলতে শুরু করলে লাড্ডু ভাই এরকম করে।

‘নাহ, এত অপচয় আর সহ্য হচ্ছে না।’ ভাই আফসোসের গলায় বলল।

‘কিসের অপচয় লাড্ডু ভাই? সবগুলো মুড়িই তো একা সাবাড় করলে। নিচে দুয়েকটা পড়লে যে অবলা পিঁপড়েরা খাবে, তারও তো উপায় নেই।’ মিথেনটা অবাক হয়ে বলল।

লাড্ডু ভাই হুতোম প্যাঁচার মতো চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকাল। তারপর চটাস করে বাঁ হাতের একটা চাঁটি ছুড়ে দিলো তার চুলে ভরা চাঁদি লক্ষ্য করে। মিথেনটা খুব সেয়ানা, টুপ করে বসে পড়তেই সেটা আমার কানে এসে লাগল।

‘উহুহুহুহু! মারছো কেন লাড্ডু ভাই!’

‘চুপ থাক! যতসব উজবক, পাতি বক, ঢ্যাঙা বকের দল। তোরা পড়ে আছিস মুড়ি নিয়ে। পরীক্ষা শেষ হয়েছে ওয়ান

উইক মানে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। অথচ এখন পর্যন্ত কোনো অভিযানেই বের হতে পারলাম না! সেই খেয়াল তোদের একটারও আছে শুনি? দিব্যি কাবুল কাকার ভাজাপোড়া খেয়ে পেটে একেবারে গ্যাসফিল্ড বানিয়ে ফেলছি।

দুদিন পর কলেজে ভর্তি হওয়া লাগবে। আর কলেজে ঢোকা মাত্র ক্যালকুলাসের প্যাঁচ কষে স্যারেরা ল্যাঙ মেরে ব্যাঙ বানিয়ে দিবেন। এখনকার এই সময়টা তখন আর ফিরে পাবি? লাড্ডু ভাই আঙুল চাঁটতে চাঁটতে আমাদেরকে হাঙরের মতো দাঁত খিঁচল।

‘কারে ব্যাঙ বানাইব, লাড্ডু ভাই?’ বিটুটা এসেই খাঁটি দেশি উচ্চারণে প্রশ্নবাণ ছুড়ে দেয়। ওর হাতে আলুপুরির প্যাকেট দেখতেই লাড্ডু ভাইয়ের চোখ দুটো হ্যাজাক লাইটের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘এতক্ষণ লাগে নাকি ব্যাটা ব্যাটারি নষ্ট ওয়াচ, চাকা পাংচার ট্রাক, তারপর... নাহ! আর কিছু মনে পড়ছে না। দে দেখি এদিকে, একটু টেস্ট করি।’

এই বলে খপ করে ওর হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে টপাটপ মুখে পুরতে লাগল। আমরা সবাই অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখছি। লাড্ডু ভাইয়ের যে ঢাউস পাকস্থলী, তাতে শাহবাগীদের কাঙাল ভোজের খিচুড়ির ডেকচি উপুড় করে ঢেলে দিলেও এক কোনো খালি পড়ে থাকবে। মিথেনটা হাহাকার করে উঠল,

‘এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না লাড্ডু ভাই। আমাদের ভাগে কম পড়বে তো!’

‘আহাহাহাহা! কী খাসা বানিয়েছে রে। মারহাবা।’

লাড্ডু ভাই তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আমাদের দিকে প্যাকেটটা ছুড়ে দিলো,

‘এই নে, যা আছে সব তোদের। মনের সাধ মিটিয়ে খা।’

হাতে নিয়েই আমরা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লুম প্যাকেটের ওপর। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি, ততক্ষণে অর্ধেক আলুপুরি লাড্ডু ভাইয়ের পেটে চালান হয়ে গেছে। তবুও যে-কয়টা ভাগে পড়েছে তা-ই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে চোখ বুজে পেটটাকে সান্ত্বনা দিলাম, ‘মন খারাপ করিস না ব্যাটা। লাড্ডু ভাই থাকতে যে এই দুটো পেয়েছিস, এ-ই তো বেশি!’

জায়গামতো ‘কড়ি’ পড়তেই লিডারের বুদ্ধি খুলতে শুরু করল। হাসিহাসি মুখ করে বলল,

‘শোন, এই যে বিশাল বড় ছুটি পড়ে আছে। এর মাঝে যদি গত বৈশাখের ওই জমিদার বাড়ির মতো একটা ঝাঁকাস অ্যাডভেঞ্চার করতে না পারি, তাহলে কিন্তু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাসে তোদের সব কটার নাম আলকাতরা দিয়ে লেখা হয়ে যাবে। তারপর যতই ঝামা ঘষিস, সেই নাম আর উঠবে না।’

‘কোন জমিদার বাড়ির কথা কইতাসো, ওই পারুলিয়ারডা? যেইডার পাঁচিলের ভিত্তে দোরা হাপ দেইক্ষা তুমি চাচা-চাচির নাম নিয়া ইয়া বড় এক হাইজাম্প দিসিলা। ওইডা নাকি, লাড্ডু ভাই?’

লাড্ডু ভাইয়ের মুখটা বেশ গোলগাল। সময়ে সময়ে দেখলে আস্ত ফুটবল বলেই ভ্রম হয়। সেই গোলআলুর মতো মুখের ঠিক মাঝখানে চিকন লম্বা একটা নাক ট্যাঁড়সের মতো সামনে ফলা মেলে আছে। মিথেনটা দুষ্টুমি করে প্রায়ই বলে, লাড্ডু ভাই নাকি তার নাক দিয়েই কলিং বেল চাপে। হাত লাগাতে হয় না। চিবুকের নিচে বুলছে কচি কচি কয়টা দাড়ি। প্রতিদিন ফজরের পর জয়তুনের তেল মেখে লাড্ডু ভাই সেগুলো চন্দনের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ান। দেখতে বেশ লাগে।

চকচকে সেই দাড়িগুলো মুঠি করে ধরে জলডোরা সাপের মতো ফৌঁস ফৌঁস করে লাড্ডু ভাই বলল,

‘টুকুন, ওই বিট্টুকে মুখ সামলে কথা বলতে বল। রাগে কিন্তু আমার গা রিরি করে কাঁপছে। সেদিন যদি দাঁড়াশ না হয়ে কোবরা হতো, আর এই উজবকটা ছোবল খেত, তখন তো পটল তুলে ওইখানেই খিঁচ দিয়ে পড়ে থাকত। সেই সময় এই লাড্ডু ছাড়া...

আমি আর মিথেন লাড্ডু ভাইকে শান্ত করলাম,

‘বাদ দাও না লাড্ডু ভাই। অ্যাই বিট্টু, তুই থাম তো।’

মিথেন ওর হাতের শেষ পুরিটা লাড্ডু ভাইয়ের মুখে পুরে দিলো। চিবুনের মতো কিছু একটা পেয়ে তার আগ্নেয়গিরির মতো মগজটা কুলফির মতো ঠান্ডা হয়ে এল। বেশ আয়েশ করে বলল,

‘উমম... কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় বল তো। এত বড় ছুটি। সাতদিন ঘরে থেকেই তো অ্যাপেন্ডিক্সটা ওই টুকুনের

दूई



রাত দশটা বেজে ত্রিশ।

মিথেনদের বাড়ির উঠোনে বিশাল দুইটা শীতল পাটি বিছানো। বাঙ্গিপুর জ্যাকফ্রুট ক্লাবের সকল মেম্বার তাতে হাত-পা মেলে চিতপটাং হয়ে শুয়ে আছি। আসল ভোজন পর্ব খতম। এখন বোয়াল মাছের মতো হা করে চাঁদের আলো চিবুচ্ছি আর গিলছি।

পাশে তাকিয়ে দেখি, লাড্ডু ভাই তার সদ্য গজিয়ে উঠা ভুঁড়িটায় আলতো করে হাত বুলাচ্ছে। গোটা দশেক মুরগির পিস, এক বোল গরুর সিনার মাংস, তিনটা খাসির লেগপিস, পাঁচটা গাবদা গাবদা চিংড়ি, এক বাটি খেজুরের গুড়ের ক্ষীর, পোয়াখানেক হালুয়া, এক হাড়ি রসগোল্লা—এইসব সে একাই সাবাড় করে দিয়েছে।

আর আমি কী খেয়েছি জানতে চাও? আহারে পোড়া কপাল। কোন দুর্বুদ্ধিতে যে লাড্ডু ভাইয়ের পাশে বসেছিলাম! মিথেনের দাদি মাত্রই প্লেটে একটা চিংড়ি দিয়েছে। খপ করে সেটা তুলে নিয়ে বলল,

‘আহাহাহাহা দাদি, করেন কী করেন কী! ওর তো গুরুপাক খাওয়া এমনিতেই মানা। এসব খেলে পরে তো জায়গায়ই পটল তুলবে। কী রে টুকুন তুই কিছু বলিস না কেন রে!’

এ-ই বলে মাথায় দিলো কষে এক চাঁটি। ইশ! কত আইটেম রৈঁধেছেন কাকি। কিন্তু সবগুলো তখনো টেস্টই করতে পারলাম না। কী আর করা, মুখটা মুখপোড়া হনুমানের মতো কালো করে মসুরি ডাল আর আলু ভাজি দিয়ে কোনোরকম চারটা ভাত খেয়ে

উঠে পড়লাম।

ঘরে প্রচণ্ড গরম, তার ওপর বিদ্যুৎ চলে গেছে। আমার পাশেই মিথেনের ফুপা খয়ের খাঁ। বড় মজার মানুষ তিনি। চিটাগাং ইপিজেডে চাকরি করেন। যখনই আসেন, আমাদের জন্য কেজি কেজি মিষ্টি-মন্ডা নিয়েই আসেন। তার বদৌলতে আমাদের চার মাথারও জম্পেশ একটা ভূরিভোজ হয়ে যায়।

ভাগে কম পেয়েছি বলে মনে মনে হাপিত্যেশ করছি। হঠাৎ পাশ থেকে বিশাল এক ভয়ংকর গর্জন ভেসে আসলো। ফুপা একটা জলচৌকিতে বসে তাল পাতার হাতপাখা দিয়ে বাতাস খাচ্ছিলেন। আচমকা এমন গর্জন শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলেন। তারপর তিন ফিট লাফিয়ে চিতল মাছের মতো চিতপটাং হয়ে বললেন,

‘ও আল্লাহ! সিংহ!’

লাড্ডু ভাই একটু শরম পেয়ে বলল, ‘ভয় পাবেন না ফুপা। আমি একটু ঢেঁকুর তুলেছি।’

বিটুটা ফোঁড়ন কাটল, ‘হ। এটুই তো তুলসো। এক্কেবারে পাতাল থেইক্কা আগ্নেয়গিরির লাভায় উতরানি উঠসে।’

লাড্ডু ভাই ফুপার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওর পেটে মেপে একটা ছোট মোক্কা বসাল। ‘ওপ!’ বলে একটা শব্দ করেই বিটুর বেয়াড়া মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।

ততক্ষণে ফুপা আবার তার আসনে মানে জলচৌকিতে ফিরে এসে বসেছেন। চওড়া মুখে চিনিগুঁড়া হাসি দিয়ে বললেন,